"সকল ধর্ম সত্য"

বেশ কয়েকবছর আগের কথা। হিন্দুধর্মশিক্ষা বিষয়ে স্কুলপাঠ্য একটা বই নেড়েচেড়ে দেখছিলাম। সম্ভবত চতুর্থ শ্রেণীর বই ছিল সেটা। তাতে একটা পরিচ্ছেদ দেখলাম নাম দেওয়া হয়েছে "সকল ধর্ম সত্য।"

কৌতূহলবশত পড়ে দেখলাম কী লেখা। দেখলাম লিখেছে- সৃষ্টিকর্তাকে হিন্দুরা ঈশ্বর বলে, মুসলমানরা আল্লাহ্ বলে, খৃস্টানরা God বলে, আসলে তিনি একজনই। কাজেই সব ধর্মই একজনের উপাসনাই করে, শুধু ভিন্ন ভিন্ন পথে। সুতরাং আসলে সব ধর্মই ঠিক, কোনটাকেই ভুল বলা উচিত না।

আমি বহু অমুসলিমের সাথে কথা বলে দেখেছি, তারা প্রায় সবাই এমন ধারণাই পোষণ করে। সেটা এরকম যে, সৃষ্টিকর্তা আসলে একজনই, তাঁকে একেকজন একেক নামে ডাকে। একেকজন একেকভাবে উপাসনা করে। কিন্তু সবার লক্ষ্য একটাই। সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভ। কাজেই সবগুলোই ঠিক, কারণ পথ ভিন্ন হলেও লক্ষ্য তো একটাই। যেমন আমি ঢাকা থেকে কুমিল্লা যাব। অনেকগুলো রাস্তা আছে যাওয়ার। কিন্তু সব রাস্তাই কুমিল্লা গিয়ে মিলেছে। কাজেই আমি যে পথই নেই না কেন লক্ষ্যে ঠিকই

পৌঁছব। একইরকমভাবে সৃষ্টিকর্তাকে আমি যেভাবেই উপাসনা করি না কেন তাঁকে আমি পাব, যদি আমার উদ্দেশ্য সৎ থাকে।

একজন মানুষ যদি স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করে, তার কাছে হয়তো কথাগুলো যুক্তিযুক্ত মনে হবে। তাই এমনকি অনেক মুসলিমও শুনেছি এ কথা বলে যে অমুসলিমরাও জান্নাতে যেতে পারে, যদি সে পাপ না করে। কারণ সেও তো সৃষ্টিকর্তারই উপাসনা করছে, শুধু পথটা ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, মাদার তেরেসা বা নেলসন ম্যান্ডেলার মত ভালো মানুষেরা, যারা আজীবন মানবসেবা করে গেলেন, কেবল অমুসলিম হবার কারণেই কি তারা জাহান্নামে যাবেন ? এটা কি অবিচার নয়?

লালন-বাউল আর কী কী যেন মারফতি গান-কবিতা আছে সেখানেও সব ধর্মের Unity এর কথা বলা হয়। ধর্মে-ধর্মে হানাহানির মূলে নাকি এটাকে মানতে না পারার মানসিকতা। মানুষ যখন নিজের ধর্মকেই কেবল সঠিক মানে, তখনই অনর্থ সৃষ্টি হয়।

সেদিন আমার এক অমুসলিম বন্ধু বলল, মানুষ যেকোন ধর্মই পালন করুক, সে যদি সেটা ঠিকভাবে পালন করতে পারে, তাহলে কখনো পথ হারাবে না। কথা তো সত্যই, তাই নয় কী? সব ধর্মই তো ভালো কথা বলে। কাজেই কেউ যদি “ধার্মিক” হয়, যেকোন ধর্মেরই হোক, সে অবশ্যই ভালো মানুষ। তার দ্বারা খারাপ কাজ

হবেনা, পাপ হবে না। অন্যায়কাজকে কোন ধর্মই উৎসাহিত করেনা। সুতরাং সবাই নিজ নিজ ধর্ম ঠিকভাবে মেনে চললেই পৃথিবীটা সুন্দর ও প্রাণবন্ত হত। হানাহানি, মারামারি থাকত না।

২

এতক্ষণ আমি যা আলোচনা করলাম তা হল অমুসলিমদের একটা বড় অংশের ধারণা এবং যুক্তি। সেটা হল স্রষ্টাকে পাবার হাজারটা পথ আছে, সে কারণেই ধর্মের এ বৈচিত্র্য। সবগুলো পথই ঠিক, কোনটাকেই ভ্রান্ত বলা উচিত নয়।

এখন আমরা দেখব ইসলাম এ ব্যাপারে কী বলে। সূরা আল-ইমরানের ৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেনঃ

যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থ।

তারমানে এত যুক্তি, এত মানবতত্ত্ব, এত সম্প্রীতির বাণী ইসলাম এক ফুঁৎকারে উড়িয়ে দিচ্ছে। আর বলছে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করা হবে না, কস্মিনকালেও না।

ইসলাম কেন এত সাম্প্রদায়িক হচ্ছে? অন্যান্য ধর্মকে এককথায় 'বাতিল' কেন বলছে? আসুন কারণ অনুসন্ধান করি।

সব ধর্মের Unification মতাদর্শের অনুসারীরা সাধারণত যে মতগুলো পোষণ করে সেগুলো এমনঃ

ক) যেহেতু ঈশ্বর একজনই কাজেই যে যেভাবে পারে তাঁর উপাসনা করলেই তাঁকে পাওয়া যাবে। যেমন সৃষ্টিকে একটি বিন্দু এবং ঈশ্বরকে আরেকটি বিন্দু ধরলে বলা যায়, দুটি বিন্দুর সংযোজক অসংখ্য রেখা থাকা সম্ভব। সে প্রতিটি রেখাই একেকটি ধর্ম, যার সবগুলো ঈশ্বরের নৈকট্য লাভে সহায়ক।

খ) বিশ্বজগতের সবকিছু ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। তিনিই বিভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করেছেন, বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য। যেহেতু সব ধর্ম তাঁরই সৃষ্টি, কাজেই কোনটাকেই অবজ্ঞা করা সমীচীন নয়।

গ) যেহেতু প্রতিটি ধর্মই মানুষের কল্যাণের কথা বলে, ন্যায়ের কথা বলে, তাই যেকোন ধর্মের মানুষ নিজের ধর্ম পুরোপুরি পালন করলে সে সার্থক মানুষ, তার প্রতিদান জান্নাত।

আসুন ইসলামের আলোকে ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করি।

প্রথমত, সৃষ্টিকে একটি বিন্দু এবং ঈশ্বরকে আরেকটি বিন্দু ধরলে বলা যায়, দুটি বিন্দুর সংযোজক অসংখ্য রেখা থাকা সম্ভব।

হ্যাঁ। কথা সত্য। অসংখ্য রেখা থাকা সম্ভব। কিন্তু এটা সত্য যে, দুইটি বিন্দুর মধ্যে যে অসংখ্য রেখা থাকা সম্ভব তন্মধ্যে একটি বাদে সবই বক্ররেখা (Curve). কেননা জ্যামিতি সম্পর্কে যার সামান্য ধারণা আছে তিনি জানেন দুইটি বিন্দুর মধ্যে একটি এবং কেবল একটি সরলরেখা (Straight line) থাকা সম্ভব। বাকি সব কার্ভ।

এই সরল পথটাই হল সীরাতুল মুস্তাক্বীম, যাকে আমরা আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ (Complete surrender to Allah) বলি, এটাই হল ইসলাম। আর সীরাতুল মুস্তাক্বিমই হল Straight Line এর আরবী।

আমরা প্রতিদিন নামাজে সূরা ফাতিহায় এই কথাটিই বলি-"আমাদের সীরাতুল মুস্তাক্বীম প্রদর্শন করুন, তাঁদের পথ যারা তোমার নিয়ামতপ্রাপ্ত হয়েছে; তাদের পথ নয় যারা পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্ত।"

সুতরাং বোঝা গেল যারা আল্লাহ্র নিয়ামতপ্রাপ্ত, তাঁদের পথটিই হল সীরাতুল মুস্তাক্বীম। আর সেটি Straight Line, কাজেই একটিই পথ। আদম (আ) থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সমস্ত নবী-রাসূল এই Straight Line টিরই সন্ধান দিয়েছেন, এই একটি পথেই মানুষকে ডেকেছেন। সৃষ্টির

শুরু থেকে সরল পথ ঐ একটিই, তাকে যারা গ্রহণ করেছে, তারা সফল হয়েছে, আর যারা বিচ্যুত হয়ে বক্রপথ অনুসরণ করেছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

অতএব, একাধিক পথে আল্লাহ্কে পাবার মতবাদটি ইসলাম প্রত্যাখ্যান করছে। আমরা সালাতের প্রতি রাকাতে নিজের মুখ থেকেই তা স্বীকার করি।

দ্বিতীয়ত, বলা হচ্ছে যেহেতু সব ধর্ম আল্লাহরই সৃষ্টি, কাজেই কোনটাই উপেক্ষনীয় নয়।

হ্যাঁ, এটা সত্য যে মহাবিশ্বের সবকিছু আল্লাহরই সৃষ্টি এবং তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। তিনি ভালো এবং মন্দ উভয়কেই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তার মানে কি এটাই যে, তাঁর সব সৃষ্টিই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য?

একটা উদাহরণ দিই। ধরা যাক একজন শিক্ষক তাঁর ৬০ জন ছাত্রের পরীক্ষা নেবেন। সেজন্য প্রশ্নপত্র তৈরি করলেন। প্রশ্নপত্র বানালেন স্ট্যান্ডার্ড, মানে একেবারে সোজাও না আবার খুব বেশি কঠিনও না। শিক্ষক জানেন তিনি এই প্রশ্নে পরীক্ষা নিলে অন্তত ৫ জন ছাত্র ফেল করবে। অথচ শিক্ষক তো চান না তাঁর কোন ছাত্র ফেল করুক। তিনি ইচ্ছা করলে একেবারে সোজা প্রশ্ন করতে

পারেন, যাতে সবাই পাশ করে। কিন্তু তা ই কি তিনি করবেন? তাহলে পরীক্ষা হবে কীভাবে?

ঠিক তেমনিভাবে বিশ্বজগতে যা কিছু ভালো, তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্, যা কিছু খারাপ তার সৃষ্টিকর্তাও আল্লাহ্; কিন্তু তিনি বান্দাদের কাছে খারাপটা কামনা করেন না, যেরূপ শিক্ষক চান না কেউ ফেল করুক। তা সত্ত্বেও শিক্ষক যেমন একেবারে সহজ প্রশ্ন বানান না, তেমনি আল্লাহ্ও ভালোর পাশাপাশি মন্দও রেখেছেন, যা দ্বারা মানুষের পরীক্ষা হয়ে থাকে।

একইভাবে আল্লাহ্ সব ধর্মই সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু অবশ্যই সব ধর্মই তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। যদি কেবল ইসলামই থাকত, অন্যধর্মের অস্তিত্ব না থাকত, তাহলে মানুষের পরীক্ষা হত কীভাবে? আল্লাহ্ জানেন তাঁর সব বান্দা পরীক্ষায় পাশ করবে না, কেউ সত্য দ্বীন গ্রহণ করবে, কেউ ভ্রান্ত পথে অটল থাকবে; তবু তিনি অন্যধর্মের অস্তিত্ব রেখেছেন, যাতে মানুষ পরীক্ষিত হয়। কাজেই "সব ধর্ম আল্লাহ্ বানিয়েছেন, অতএব সবধর্মই আল্লাহ্র পছন্দ" বলা যুক্তিসঙ্গত নয়, যেভাবে "শিক্ষক প্রশ্ন কঠিন করেছেন ছাত্রদের ফেল করাতে, অতএব ফেল করাটা শিক্ষকের পছন্দ" বলা অযৌক্তিক।

প্রিয় পাঠক, এবার আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপারে আলোকপাত করতে যাচ্ছি, যা নিয়ে অমুসলিম তো বটেই, মুসলিমদের একটি বড় অংশও বিভ্রান্তির মধ্যে আছে।

তা হল তাদের তৃতীয় যুক্তি, যেহেতু কোনধর্মই অন্যায়কাজে উৎসাহিত করেনা, সুতরাং যেকোনধর্মের 'ধার্মিক' ব্যক্তিই ভালো লোক, তার জান্নাতে যাওয়া উচিত।

অথচ ইসলাম বলছে ইসলাম ব্যতীত অন্যধর্মকে গ্রহণকারী ব্যক্তি আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অর্থাৎ জাহান্নামে যাবে।

কেন এই কঠোরতা?

এটা বুঝতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে। আমরা কেন এ পৃথিবীতে? আল্লাহ কেন আমাদের পাঠিয়েছেন একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য?

সূরা যারিয়াতের ৫৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ এর উত্তর দিয়েছেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“আমি জ্বিন ও মানবজাতিকে আমার ইবাদাত ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।”

আরবী ভাষার একটি সাধারণ নিয়ম হল, কোন ব্যাপারে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে

Negetivity দিয়ে বাক্য শুরু হয়। যেমন এই আয়াতটির প্রথম অংশ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ মানে “আমি জ্বিন ও মানবজাতিকে (কোন উদ্দেশ্যে) সৃষ্টি করিনি” দিয়ে মানব ও জ্বিনজাতির সৃষ্টির সবরকম উদ্দেশ্যকে বাতিল করা হল। এরপর আল্লাহ্ বললেন إِلَّا لِيَعْبُدُونِ অর্থাৎ “কেবল আমার ইবাদাত করা ব্যতীত”। অর্থাৎ প্রথম অংশ দিয়ে অস্তিত্বের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সব প্রচলিত ধ্যানধারনা, মতবাদ বাতিল করা হল, আর দ্বিতীয় অংশে কেবল এবং কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের কথা বলা হল। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে আল্লাহ্র ইবাদাত ব্যতীত সবরকম কাজ মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্যের বহির্ভূত।

এটাই ইসলামের মূল কনসেপ্ট। আল্লাহ্ কখনোই বলেন নি মানুষকে “ভালো কাজ” করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, বলেছেন “ইবাদাত” করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং “ভালো কাজ” এবং “ইবাদাত” ব্যাপারদুটির মধ্যে পার্থক্য আছে। আমরা এখন সে পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করব।

একটি কাজ লিটারেলি "ভালো" হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্র ইবাদাত হল তা ই যা আল্লাহ্ আদেশ করেছেন। সেটা যদি প্রচলিত রীতিনীতি বা আদর্শের বিরুদ্ধে যায় তবুও।

উদাহরণস্বরূপ, কুরবানির ঈদে গরু জবাই করা কুরবানিবিরোধীদের দৃষ্টিতে "গো হত্যা" বা "প্রাণী হত্যা" তথা নিন্দনীয় কাজ। এখন আপনি যদি "পশুর প্রতি দয়া" দেখিয়ে তাকে জবাই থেকে বিরত থাকেন, সেটা হবে তাদের দৃষ্টিতে "ভালো কাজ", কিন্তু যদি গরু "হত্যা" করেন, তবে সেটা হবে ইবাদাত, কেননা আল্লাহ্র আদেশ ছিল সেটাই।

একইভাবে বলা যায়, জিহাদের ময়দানে শত্রুকে হত্যা করা অনেক বড় একটি ইবাদাত। অথচ আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি খারাপ কাজ, হানাহানি, রক্তপাত। কিন্তু এই রক্তপাতের মাধ্যমেই আল্লাহ্র উপাসনা হবে, কারণ আল্লাহ্র নির্দেশ ছিল এটাই। এই "নৃশংসতা" যদি আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায়, তবু এটি মেনে নিতে হবে, কারণ আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ- সেটা বিচার করার ক্ষমতা মানুষের নেই। সূরা বাক্বারা ২১৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেনঃ

“তোমাদের ওপর যুদ্ধকে ফরয করা হল, যদিও তোমরা একে অপছন্দ কর। হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের জন্য কল্যাণকর, কিন্তু তোমরা তা অপছন্দ কর। আবার কোন একটি বিষয় তোমাদের জন্য অকল্যাণকর, কিন্তু তোমরা তা পছন্দ কর। বস্তুত তোমরা জান না, আল্লাহ জানেন।”

কাজেই আমাদের দৃষ্টিতে কোনটি “ভালো কাজ”, সেই বিচার দিয়ে পার পাওয়া যাবে না, বরং দেখতে হবে আল্লাহ্ কোনটিকে উত্তম বলেছেন।

যেকোন কাজ “ইবাদাত” হতে হলে মোটামুটি তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবেঃ

প্রথমত, কাজটি আল্লাহ্র নিকট পছন্দনীয় হতে হবে। নিজের প্রবৃত্তি যেটা ভালো বলবে সেটা নয় বরং আল্লাহ্ যেটাকে ভালো বলেছেন সেটাই করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, কাজটি হতে হবে রাসূল (সা) এর দেখানো পথে। যেমন নামাজ অনেক বড় ইবাদাত, কিন্তু কেউ যদি “বেশি নামাজ পড়া ভালো” ভেবে ফজরের ২ রাকাত ফরয নামাজের জায়গায় চার রাকাত পড়ে, তবে সেটা ইবাদাত হবে না কারণ রাসূল (সা) শিখিয়েছেন ২ রাকাত পড়ার জন্য।

তৃতীয়ত, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটি, তা হল কাজটি হতে হবে কেবল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য। কোন পার্থিব স্বার্থ বা উদ্দেশ্য থাকলে তা "ইবাদাত" বলে গণ্য হবে না এবং আখিরাতে তার কোন প্রতিদান পাওয়া যাবে না।

কিয়ামতের ময়দানে প্রথম তিনজন ব্যক্তি যারা জাহান্নামী হবে তার একজন 'আলিম একজন জিহাদে শহীদ এবং আরেকজন অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি। এই তিনজনের মর্যাদা হওয়ার কথা অনেক অনেক বেশি, উলটো তারা কি না জাহান্নামী!! কেন?

এটা এজন্য যে, 'আলিম জ্ঞান অর্জন করেছিল যাতে লোকে তাকে জ্ঞানী বলে, শহীদ যুদ্ধ করেছিল যাতে লোকে তাকে "বীর" বলে, আর দানশীল ব্যক্তি দান করত যাতে লোকে তাকে দাতা বলে। অর্থাৎ কেউই আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করতে কাজ করেনি, ফলে তাদের কাজ ইবাদাত হয়নি। অর্থাৎ আল্লাহ্ যে উদ্দেশ্যে তাদের সৃষ্টি করেছিলেন তা তারা পূরণ করেনি। তাই এত মর্যাদাপূর্ণ কাজের পরও তারা জাহান্নামী।

সুতরাং মানুষ যতই "ভালো কাজ" করুক, যদি তা "ইবাদাত" না হয়, তবে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আল্লাহ্ বলেছেনই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ইবাদাতের জন্য, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। যেখানে মুসলিম হবার পরেও "ইবাদাত" না হওয়ায় অমন

তিনজন ব্যক্তি জাহান্নামে গেলেন, সেখানে কীভাবে আশা করা যায় যে ইসলাম গ্রহণ না করেই কেউ জান্নাত পাবে? অমুসলিমদের "ভালো কাজ" এর পরেও জাহান্নামে যাবার কারণ মূলত এটাই।

তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্ ন্যায়বিচারক। তাই অমুসলিমদের "ভালো কাজ" এর জন্য আখিরাতে তারা উপকৃত না হলেও এর ফল তিনি তাদের দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। মাদার তেরেসা বা নেলসন ম্যান্ডেলা দুনিয়াজোড়া খ্যাতি পেয়েছেন, মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন, নোবেল পেয়েছেন। কিন্তু তাঁরা আল্লাহ্কে একমাত্র ইলাহ মানেন নি, কাজেই তাদের কাজ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ছিল না, এটা বলাই বাহুল্য। ফলে তা "ইবাদাত" হয়নি, আর সেজন্যই ঈমান নিয়ে না মরে থাকলে এত মানবসেবার পরও তারা জাহান্নামী হবেন।

কাজেই মুক্তির পথ একটিই। আল্লাহ্র কাছে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ। অন্য সকল পথ, সকল মত ভ্রান্ত, যারা তা অনুসরণ করবে তারা ক্ষতিগ্রস্থ, উভয় জীবনে।

৪

নিরীশ্বরবাদী দুয়েকটি ধর্ম (যেমন বৌদ্ধধর্ম) বাদে মোটামুটি সবধর্মই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে। কেউ হয়তো একেশ্বরবাদী, আবার কেউ হয়তো বহুঈশ্বরে বিশ্বাস করে। কিন্তু

স্রষ্টাকে এরা সবাই মানে। অথচ ইসলাম মুসলিম বাদে সবাইকে ‘কাফির’ বলছে। কেন?

অনেকে “কাফির” শব্দটাকে একটা গালি বা অনুরূপ কিছু ভেবে থাকেন। অথচ সূরা কাফিরূনে আল্লাহ্ নিজেই “বলুন, হে কাফিরগণ” বলে সম্বোধন করতে বলেছেন। “কাফির” শব্দের মানে প্রত্যাখ্যানকারী। অর্থাৎ যারা তাওহীদের বাণীটাকে প্রত্যাখ্যান করে, তারাই হল কাফির। এখন তাহলে সম্পূরক প্রশ্ন এসে যায়, তাওহীদকে গ্রহণ আর প্রত্যাখ্যান বলতে কী বোঝায়?

আদম ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সমস্ত নবী-রাসূল মানুষকে একটি দাওয়াতই দিয়ে গেছেন, তা হল এই তাওহীদের দাওয়াত। তাওহীদকে যারা গ্রহণ করেছে, তারাই সফল হয়েছে, আর যারা প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাওহীদ মানে আল্লাহ্র একত্ববাদ।

আল্লাহ্র একত্ববাদ মানে কী? আল্লাহ্ দুইজন নয় বরং একজন, এটাই কি আল্লাহ্র একত্ববাদ?

আমাদের অনেকের মধ্যে ভুল ধারণা রয়ে গেছে যে, একজন আল্লাহ্কে বিশ্বাস করার নামই তাওহীদ। অথচ তা ই যদি হত, তাহলে একেশ্বরবাদী সমস্ত ধর্মের মানুষই তাওহীদের সাক্ষ্য দিত।

খৃস্টানরা একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, করে ইহুদীরা, করে একেশ্বরবাদী হিন্দুরা। এমনকি মক্কার কাফিররা, আবু জাহেল, আবু লাহাবরা পর্যন্ত আল্লাহ্কে বিশ্বাস করত। আল্লাহ্ বলেনঃ

"যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।" [আনকাবুতঃ ৬৩]

তারমানে মক্কার কাফিররাও বিশ্বাস করত বৃষ্টি দেওয়া, জীবন দেওয়ার মালিক কেবল আল্লাহ্, কোন দেবদেবী বা অন্য কেউ নয়। তারাও আল্লাহ্কে 'একজন'ই মানত। তবু তারা কাফের।

এর কারণ বুঝতে গেলে আমাদের তাওহীদের বাক্যটা বুঝতে হবে। তা এই যে لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

এ বাক্যটিও শুরু হয়েছে Negativity দিয়ে। একটি ভরা পাত্রে নতুন কিছু ভরতে হলে আগে পাত্রটা খালি করতে হয়। তেমনিভাবে তাওহীদের বাণীটা মাথায় নিতে হলে অন্যসব আদর্শ, ফিলোসফি বর্জন করতে হয়। প্রথম অংশ "লা ইলাহা" অর্থাৎ "কোন ইলাহ নেই" দিয়ে আল্লাহ্ প্রথমে সকল ইলাহকে বাতিল

ঘোষণা করলেন। এরপর বললেন "ইল্লাল্লাহ" অর্থাৎ "আল্লাহ্ ব্যতীত"। আগে বর্জন, তারপর গ্রহণ। আগে সমস্ত ইলাহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ঘোষণা, এরপর বলা "কেবল আল্লাহ্ ব্যতীত" অর্থাৎ ইলাহ হবার যোগ্য কেবল এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্।

ইলাহ মানে কী? ইলাহ হলেন সেই সত্ত্বা, যিনি আনুগত্যের, উপাসনার একমাত্র যোগ্য। আমার সমস্ত অস্তিত্ব যার ওপর নির্ভরশীল, যাকে আমি সবকিছুর নিয়ন্ত্রক এবং একমাত্র ক্ষমতাশালী আর ইবাদাতের যোগ্য বিশ্বাস করি, তিনি আমার ইলাহ।

আল্লাহ্কে একমাত্র ইলাহ মেনে নেওয়া মানে জন্ম থেকে মৃত্য পর্যন্ত কেবল আল্লাহ্র আনুগত্য, তাঁর হুকুম অনুসারে জীবন সাজানো। ধরুন আপনি যে অফিসে কাজ করেন তার বস আপনাকে নামাজের জন্য সময় দেয়না। এখন আল্লাহ্র আদেশ হল ওয়াক্তমত নামাজ পড়া, আর বসের আদেশ হল সে টাইমে অফিসের কাজ করা। আপনি যদি বসের কথা মানেন তবে আপনি সে মুহূর্তে 'ইলাহ' তথা আনুগত্যের যোগ্য মানলেন, অথচ মানার কথা ছিল আল্লাহ্কে, বসকে অসন্তুষ্ট করে হলেও। সুতরাং এক্ষেত্রে আপনি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" মানতে পারেন নি, যেহেতু আপনার কাছে বসের আনুগত্য আল্লাহ্র আনুগত্যের ওপর প্রাধান্য পেয়েছে।

ঠিক তেমনিভাবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আল্লাহ্র হুকুম বাদ দিয়ে যখন মানুষের তৈরি আইন, নীতি দিয়ে বিচার করা হয়, তখন সেটা সুস্পষ্টভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর লঙ্ঘন। আপনি যদি আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে জনগণকে ক্ষমতার মালিক মানেন, সেখানে আপনাকে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে জনগণকে 'ইলাহ' মানলেন।

তেমনি কিছু লোক ভোটের দাবিদার হয়ে আইনসভায় গিয়ে আইন বানাচ্ছে, সেখানে তারা নিজেদের 'ইলাহ' এর আসনে বসাচ্ছে। কারণ তারা নিজেদের পছন্দমত আইন তৈরি করছে, যেগুলো সরাসরি কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক, অথচ আইনগুলো আল্লাহ্র দেওয়া, যেগুলো বাতিলের ক্ষমতা কারো নেই। কাজেই কেউ যদি তা বাতিল করে তারমানে সে আল্লাহ্র চেয়ে নিজেকে ক্ষমতাধর দাবি করছে, আর নিজেকে ইলাহর আসনে বসিয়েছে।

সূরা তাওবার ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন-

"তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মা'বূদের ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তারা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র।"

আয়াতটি লক্ষ করুন। আল্লাহ্ এখানে বলছেন ইহুদি-খৃস্টানদের কথা, যে তারা নিজেদের পাদ্রী-পুরোহিতকে 'রব' বানিয়ে নিয়েছিল। যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অংশটি তিলাওয়াত করছিলেন তখন হযরত আদি ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহু'আনহু বলেছিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ , তারা তো পুরোহিতদের সামনে রুকু সেজদা করে না, তাহলে তারা কীভাবে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছিল? "

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

"কেননা তাদের এসব পুরোহিতরা যখন কোন কিছুকে হালাল (বৈধ) সার্টিফিকেট দিত তখন সমাজের মানুষ সেটাকে হালাল মনে করতো, হারাম (অবৈধ) সার্টিফিকেট দিলে হারাম। তারা আল্লাহর কালাম অনুযায়ী যাচাই করতো না।"

সুতরাং আমরা দেখছি আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন পুরোহিত-যাজকদের কথা অনুসারে যারা বৈধ-অবৈধ নির্ধারণ করত, তারা মুশরিক, তারা আল্লাহ্র আসনে এই পুরোহিতদের বসিয়েছে। আমরা কি বর্তমান সভ্যদেশে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার দেখিনা? সুদকে আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করেছেন, দেশের আইন কি সেটাকে বৈধতা দেয়নি? পতিতালয়কে বৈধতা দেয়নি? জেনা-ব্যাভিচারকে দেয়নি? এখন আপনি যদি আল্লাহদ্রোহী এই আইনের

আওতায় যেয়ে সুদ, পতিতালয়কে অবৈধ না ভাবেন, তারমানে আপনি দেশের আইনপ্রণেতাদের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছেন, যেমনটা সেকালের লোকেরা তাদের যাজক-পুরোহিতদের বানিয়েছিল।

মক্কার কুফফাররাও আল্লাহকেই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, জীবন ও মৃত্যুর মালিক বলে মানত, যেটা একটু আগেই বলেছি। তবু তারা কাফের। কারণ তারা বিধানদাতা, হুকুমের মালিক হিসেবে আল্লাহকে মানেনি। একইভাবে ফির'আউনও আল্লাহকে বিশ্বাস করত, কিন্তু সে ক্ষমতা, আইন আর সার্বভৌমত্বের মালিক হিসেবে নিজেকে দাবি করত, আল্লাহকে নয়। তাই সে কাফির।

এজন্য আল্লাহ্ একাধিক নয় বরং 'একজন', এটা একেশ্বরবাদের সাক্ষ্য হতে পারে, কিন্তু তাওহীদের সাক্ষ্য নয়। আল্লাহকে জীবন-মৃত্যু, রিজিক, ক্ষমতা, হুকুম, সার্বভৌমত্বের একমাত্র মালিক ও কর্তৃত্বের দাবিদার হিসেবে মেনে না নিলে কখনোই তাওহীদের ওপর পূর্ণ ঈমান থাকবেনা। তাওহীদের বাণী কেবল মসজিদের জন্য নয়, দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত কেবল আল্লাহ্র আনুগত্য চলবে, বেডরুম থেকে হোয়াইট হাউজ পর্যন্ত কালিমার বাণী প্রতিষ্ঠিত হবে। আইনসভা, বিচারসভা, বঙ্গভবন সমস্ত জায়গায় কেবল আল্লাহ্র হুকুম আর বিধানের আনুগত্য চলবে, আর কারো নয়। এটাই তাওহীদের মূল কথা।

সুতরাং কেবল মুখে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ নয়, বরং কথায় ও কাজে তার প্রমাণের মাধ্যমে একজন প্রকৃত মুসলিম হওয়া সম্ভব। মুখে কেবল আল্লাহ্কে মালিক বলব, আর আনুগত্য করব তাগুত সরকারের, মানবরচিত আইনের, তাহলে শিরক থেকে বেরোনো যাবেনা। যেমনটা আল্লাহ্ বলেছেনঃ

"অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে।" [সূরা ইউসুফঃ ১০৬]

এ আলোচনায় আমরা স্পষ্ট দেখলাম, এমনকি একজন মানুষ নিজেকে মুসলিম দাবি করেও তাওহীদের বিপরীতে থাকতে পারে। তাহলে যারা ইসলামকেই গ্রহণ করেনি, তাদের পক্ষে কীভাবে তাওহীদে প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভব? এ কারণেই ইসলাম তাদের ‘প্রত্যাখ্যানকারী’ বা ‘কাফির’ সম্বোধন করেছে।

পৃথিবীতে “সনাতন ধর্ম” নামে একটি ধর্ম প্রচলিত। সনাতন শব্দের মানে আদি ও প্রাচীন। অথচ প্রকৃত সনাতন ধর্মের নাম ‘ইসলাম।’ কারণ ইসলামের মূল কথা হল তাওহীদ, আর তাওহীদের বাণী জগতের প্রথম মানুষটি থেকেই প্রচারিত হয়ে আসছে।

অতএব ইসলাম নতুন আবির্ভূত হওয়া কোন ধর্ম নয়। এটি হাজার বছর ধরে চলে আসা একটি মূলনীতি, যা মানুষের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক সাফল্যের শর্ত। আদম (আ) থেকে শুরু করে এই তাওহীদই প্রচারিত হয়েছে, যা কেবল একটিই পথ, যাকে আমরা "সীরাতুল মুস্তাক্বীম" নামে অবিহিত করি। "সীরাত" শব্দের অর্থ পথ, আল্লাহ্ সূরা ফাতিহায় "সাবিল" বা পথ শব্দের অন্য প্রতিশব্দ ব্যবহার না করে "সীরাত" ব্যবহার করেছেন, কারণ "সীরাত" শব্দের বহুবচন হয়না, আর সরল পথ কেবল ও কেবলমাত্র একটিই। আর সেটা হল তাওহীদ; সাফল্য ও মুক্তির একমাত্র পথ।

৫

আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য হল তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য। দুটো সাক্ষ্যকে একত্রিত করে যে বাক্যটা, তা কালিমা শাহাদাত নামে আমাদের সবার কাছেই পরিচিতঃ

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

এ বাক্যের দুটো অংশ। প্রথম অংশে আল্লাহ্র একত্ববাদ তথা তাওহীদের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে আর দ্বিতীয় অংশে রাসূল (সা) এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। প্রথম অংশটি নিয়ে আমরা

এতক্ষণ আলোচনা করলাম। এবারে রিসালাতের সাক্ষ্য নিয়ে কিছু কথা বলি।

তাওহীদের পাশাপাশি অবস্থান হওয়াই বলে দিচ্ছে রিসালাতের সাক্ষ্য কত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাকে স্বীকার না করলে মুসলিম হওয়া যাবে না। প্রশ্নটি হল রিসালাতের সাক্ষ্য কেন গুরুত্বপূর্ণ?

এজন্য যে, তাওহীদের সাক্ষ্যটি দেওয়ার সাথে সাথে অনেক দায়িত্ব এসে পড়ে। কেননা আপনি আল্লাহ্কে একমাত্র ইলাহ মেনে নিলে আপনার সমস্ত কাজ হতে হবে আল্লাহ্র পছন্দ অনুসারে। আর এই কাজগুলো কীভাবে করতে হবে তা প্র্যাক্টিক্যালি দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একজন রোল মডেল দরকার। তাছাড়া মানুষকে তাওহীদের বাণীটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য একজন শিক্ষকের প্রয়োজন। নবী-রাসূলরা সেই শিক্ষক ও রোল মডেলের দায়িত্ব পালন করেছেন। সুতরাং রিসালাতকে মেনে নেবার অর্থ তাঁরা আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ, এটা স্বীকার করে নেওয়া, কাজেই তাঁদের প্রচারিত তাওহীদের বাণীই সত্য তাওহীদ, এখানে আমার নিজের মনগড়া তত্ত্ব চলবেনা, এই স্বীকারোক্তি দেওয়া।

তাওহীদের বাণী সর্বযুগে অপরিবর্তিত ছিল, কিন্তু শরীয়াহ যুগে যুগে মানুষের জ্ঞান আর অনুধাবনের সামর্থ্য অনুসারে পালটেছে। তাই বিভিন্ন রাসূলের শরীয়াহর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর এই

শরীয়াহ তথা দ্বীনের পূর্ণতা ঘটেছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে, তাই এই শরীয়াহ কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে। রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া মানে এটাকে স্বীকার করে নেওয়া।

আমাদের রাসূল হচ্ছে মুহাম্মাদ (সা), তাঁর ওপর প্রবর্তিত শরীয়াহই আমাদের জন্যই প্রযোজ্য। আমরা কালিমা শাহাদাতে যখন রাসূল (সা) কে রাসূল বলে স্বীকার করছি, সাথে সাথে তাঁর দ্বীন তথা শরীয়াহর আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। অর্থাৎ রাসূল (সা) যা বলেছেন সেটাই আমাদের ধর্ম, সেটাই আমাদের জীবনবিধান, অন্য কোন কিতাব যেমন বাইবেল, বেদ বা ত্রিপিটকে মানবধর্মের কোন বাণী থাকলেও আমরা তা গ্রহণ করব না, কারণ আমরা রাসূল (সা) কেই আমাদের শরীয়াহর মডেল হিসেবে সাক্ষ্য দিয়েছি।

তাই পূর্ববর্তী কোন নবীর বিধান আমাদের জন্য ফলো করার অবকাশ নেই। রাসূল (সা) বলেছেন তাঁর সময়ে মুসা (আ) বেঁচে থাকলে তিনিও রাসূল (সা) কেই ফলো করতেন। আমরা জানি ঈসা (আ) যখন পৃথিবীতে আবার আগমন করবেন তখন তাঁর কালিমা হবে আমাদেরই কালিমা, অর্থাৎ রাসূল (সা) এর রিসালাতের সাক্ষ্য। তাই তখন তিনি নিজের শরীয়াহ নয় বরং রাসূল (সা) এর একজন উম্মাত হিসেবে রাসূল (সা) এর শরীয়াহ

ফলো করবেন। কাজেই এটা পরিষ্কার যে রাসূল (সা) ব্যতীত অন্য নবী-রাসূলের শরীয়াহ আমাদের জন্য ফলো করার কোন সুযোগ নেই।

তাহলে বলুন, যেখানে রাসূল (সা) ব্যতীত কোন নবী-রাসূলের শরীয়াহ পর্যন্ত ফলো করার অনুমতি নেই, সেখানে কীভাবে কৃষ্ণ, লালন-বাউল ফকির কিংবা কার্ল মার্কস-আব্রাহাম লিঙ্কনের প্রবর্তিত বিধান ফলো করা একজন মুসলিমের জন্য জায়েয হতে পারে?

রিসালাতের সাক্ষ্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল, কোন কাজ তখনই ইবাদাত হবে যখন সেটা রাসূল (সা) এর শেখানো পথে হবে। যেহেতু আমরা তাঁকে আল্লাহ্র রাসূল মেনে নিচ্ছি, কাজেই তাঁর পথটাই আল্লাহ্র পছন্দনীয় পথ, সেটাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের একমাত্র উপায়। নিজের ইচ্ছামত কাজ করে সেটাকে ইবাদাত ভাবার কোন সুযোগ নেই।

তাছাড়া কুরআনকে সত্য বলে স্বীকার করতে হলে যার ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে তাঁকেও সত্য রাসূল বলে মেনে নিতে হবে। রিসালাতের সাক্ষ্য তাই একইসাথে কুরআনের সত্যায়নকারী এবং কুরআন-সুন্নাহ তথা রাসূল (সা) এর শরীয়াহকে একমাত্র জীবনব্যস্থা হিসেবে স্বীকার করার নামান্তর।

অনেকে বলে থাকেন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য 'ভালো মুসলিম' হতে হবে? 'ভালো মানুষ' হওয়াটাই কি যথেষ্ঠ নয়?

এই প্রশ্নের জবাবে আমি নোটের প্রথম পর্বে কথা বলেছিলাম। কেন 'ভালো মানুষ' হওয়া যথেষ্ঠ না, ঈমান ব্যতীত ভালো কাজ কেন আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, 'ভালো কাজ' আর 'ইবাদাত' এর কী পার্থক্য, এই ব্যাপারগুলো নিয়ে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কাজেই এখানে পুনরায় আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে এ ব্যাপারে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ এখানে সংযোজন করছি। আশা করি আমরা এখান থেকে অনেক কিছু শেখার সুযোগ পাব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি সালাম সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন এটা আমরা সবাই স্বীকার করি। রিসালাতের দায়িত্ব প্রাপ্তির আগে যে চল্লিশটি বছর তিনি কাটিয়েছেন তাতে তিনি চারিত্রিক মাধুর্যের এত উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন যে মক্কার বিকৃত রুচির কুফফাররাও তাঁকে প্রাণভরে ভালোবাসত আর বিশ্বাস করত, উপাধি দিয়েছিল "আল-আমীন।"

অথচ আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামিন সূরা দ্বুহার ৭ নং আয়াতে বলেছেন,

“তিনি (আল্লাহ্) আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেন।”

একটু চিন্তা করুন। আল্লাহ্ তাকে “পথহারা” বলেছেন। আরবের সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের মানুষ হয়েও তাঁকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আল্লাহ্ পথহারা বললেন। কেন?

এজন্য যে, তিনি যতক্ষণ কুরআন প্রাপ্ত না হলেন, ততক্ষণ সত্যিকারের সীরাতুল মুস্তাক্বীমের সন্ধান পান নি। যদিও মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম,

কিন্তু আল্লাহ্ তো “ভালো মানুষ” চান নি, চেয়েছেন “ভালো দাস।” তাই কুরআনের জ্ঞান পাওয়ার আগ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত “পথহারা” বলে বিবেচিত আল্লাহ্র কাছে। যেহেতু তিনি তাঁর রবকে চিনতে পারেন নি যতক্ষণ কুরআনপ্রাপ্ত না হলেন।

সুতরাং আপনি যতই ভালো মানুষ হোন, যতই একেশ্বরবাদী হোন, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হবেন না যতক্ষণ আপনার কাছে কুরআনের জ্ঞান না থাকবে। আল্লাহ্র কাছে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের জন্য দরকার ইলমে দ্বীন, তাওহীদে ঈমান। আর

সেকারণেই কুরআনের জ্ঞান ব্যতীত কোন 'ভালো মানুষ' আল্লাহ্র নিকট পছন্দনীয় নয়।

৭

অন্যান্য ধর্মের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান কী?

আমরা গত পর্বে আলোচনা করেছি ইসলাম অন্যান্য ধর্মকে অনুমোদন দেয়নি। তাদেরকে 'বাতিল' বলে আখ্যায়িত করেছে। এ ব্যাপারে অনেক মুসলিম বলে থাকেন ইসলাম শিখিয়েছে সব ধর্মকে সম্মান করতে, কাজেই কোন ধর্মকে 'বাতিল' বলা ঠিক নয়, এতে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা কষ্ট পেতে পারে।

ভাই ও বোনেরা, এ বিষয়টাতে আমাদের খুব ভালোমত জ্ঞান থাকা জরুরি। ইসলাম সব 'ধর্ম'কে সম্মান দিতে শেখায় না, যেটা শেখায় সেটা হল সব ধর্মের মানুষকে সম্মান দিতে। ধর্মকে সম্মান করা আর ধর্মের মানুষকে সম্মান করা- এ দুটো বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। ইসলাম বলেছে যেকোন অমুসলিম অবশ্যই মানুষ হিসেবে সম্মান ও সদাচরণ পাবার যোগ্য। কিন্তু সেটা এ উপায়ে নয় যে তার ধর্মের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা থাকতে হবে। কেন?

এজন্য যে, ইসলাম বলেছে সে বাদে অন্য সকল ধর্ম, মতবাদ ভ্রান্ত। কাজেই একজন মুসলিম হিসেবে আপনাকে মেনে নিতে হবে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণযোগ্য নয়। যে বস্তু ভ্রান্ত, যেটা আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, সেটার প্রতি সম্মান থাকা কী করে সম্ভব?

আগেই বলেছি ইসলামই একমাত্র তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম, আর কোনটিই নয়। কাজেই অন্য সকল ধর্ম বা মতবাদে শিরক মিশে আছে। আর শিরক হল সবচেয়ে ভয়াবহ অপরাধ, যা ক্ষমার অযোগ্য। কাজেই শিরককে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ঘৃণা করা প্রতিটি মুসলিমের অবশ্য পালনীয়। সুতরাং যদি আপনি শিরককে ঘৃণা করেন, তবে শিরকের ওপর গড়ে ওঠা কোন ধর্ম বা মতবাদ আপনার সম্মান পেতে পারেনা।

এই কারণেই মুসলিমদের জন্য অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবে শুভেচ্ছা জানানো জায়েয নেই। অনেকে এটাকে সাম্প্রদায়িকতা বা কট্টরতা বলে থাকেন। আসলে ব্যাপারটি আমাদের বুঝতে হবে। যদি আপনি খবর পান একটা লোক আরেকটা লোককে কুপিয়ে মেরেছে আপনি কি সেই খুনিকে শুভেচ্ছা জানাতে পারবেন? কখনোই পারবেন না। কারণ খুনকে আপনি অপরাধ মানেন এবং ঘৃণা করেন।

অথচ শিরক হল খুনের চাইতেও বড় অপরাধ, যদিও এর পার্থিব শাস্তি নেই। কাজেই খুনকে যেমন আপনি ঘৃণা করছেন, শিরককেও তেমনি, বা তারচেয়েও বেশি ঘৃণা করতে হবে, এটাই ঈমানের দাবি। আপনি যেমন খুন করলে তাকে শুভেচ্ছা জানাতে পারেন না কারণ আপনি খুনকে ঘৃণা করেন, তেমনি মন্দিরে গিয়ে মূর্তিপূজার মাধ্যমে আল্লাহ্র শিরক করা হচ্ছে, এটাকে কী করে আপনি সম্মান দেখাতে পারেন, ভালোবাসতে পারেন? যদি খুনিকে খুনের জন্য শুভেচ্ছা জানাতে আপনার বাধে, তাহলে কী করে আপনি মূর্তিপূজার উৎসবে খুনের চেয়েও বড় অপরাধ শিরকে নিমজ্জিত লোকেদের 'পূজার শুভেচ্ছা' জানাতে পারেন?

ঠিক তেমনিভাবে ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা জানানোর অর্থ হল ঈসা (আ) কে আল্লাহ্র পুত্র হিসেবে মেনে নেওয়াকে সমর্থন দেওয়া, খৃস্টানদের কার্যকলাপকে সন্তুষ্টির চোখে দেখা। তাদের শিরককে ঘৃনা করতে না পারা।

একজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী যখন শিরক করে, তাতে যদি আপনার অন্তরে ব্যথা না লাগে, বুঝতে হবে আপনার ঈমানে ঘাটতির কারণে এটা হয়েছে। ইসলাম অন্য ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেনা, কিন্তু তারা শিরক করে যাচ্ছে, এটাকে পছন্দ করতেও শেখায় না। অন্য ধর্মের উৎসবে আপনার শুভেচ্ছা জানানোর মানে সে যে কাজ করে যাচ্ছে তাতে আপনি সন্তুষ্ট, যা

তাকেও নিজের ধর্মের প্রতি আরো আনুগত্যশীল করে তুলবে, অথচ আপনার এটা অত্যন্ত বেদনার বিষয় হওয়ার কথা যে, আরেকজন মানুষ জাহান্নামের পথে পা বাড়াচ্ছে।

কাজেই একজন মুসলিম হিসেবে আপনি একজন হিন্দুকে সম্মান করতে পারেন, কিন্তু হিন্দুধর্মকে না। হিন্দুধর্ম শিরকের ওপর প্রতিষ্ঠিত, এতে সম্মান রাখার কোন অবকাশ নেই। একইভাবে এমনকি একজন নাস্তিকও মানুষ হিসেবে আপনার কাছে সদাচরণ আর ইনসাফ পেতে পারে, কিন্তু তার মানে এই না যে তার নাস্তিক্যবাদকে সম্মান দেখানোর কোন সুযোগ আছে। আশা করি ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি।

তবে উল্লেখ্য, যেসব কাফির নাস্তিক ইসলামকে কটাক্ষ করে, বিদ্বেষ ছড়ায়, ইসলামের শত্রুদের সমর্থন করে, তাদের প্রতি মানুষ হিসেবেও সম্মান রাখা যাবে না। তাদের জন্য শুধুই ঘৃণা থাকতে হবে। এটাও ঈমানের দাবি আর আল ওয়ালা ওয়াল বারাহ এর নীতি।

সুতরাং 'অসাম্প্রদায়িকতা'র নামে অমুসলিমদের ব্যাপারে এমন কোন দৃষ্টিভঙ্গি থাকা যাবেনা যেটা ইসলাম অনুমোদন করেনা।

একটা ব্যাপারে কেউ কেউ আপত্তি তুলে থাকেন। একজন লোক তার জীবনে হয়তো কয়েক বছর কুফরি বা শিরক করতে পারে, যেহেতু মানুষের জীবনকাল সীমিত। এর জন্য কেন তার শাস্তি অনন্তকালের জন্য হবে? ৬০ বছরের পাপের শাস্তি কেন অনন্তকালের আগুন?

এ ব্যাপারে যুক্তিটা হল, কোন পাপী ব্যক্তিকে যদি আরো সময় দেওয়া হত, তাহলেও সে পাপই করে যেত। কোন মুশরিককে যদি ১০০০ বছর আয়ু দেওয়া হত, তবু সে শিরকই করে যেত, অনন্তকাল আয়ু দেওয়া হলেও সে এটাই করে যেত। যারা হিদায়াহ পাবার তারা স্বল্পায়ু জীবনেই পেয়ে থাকে, আর যারা পাবার নয় তারা কোনদিনই পাবেনা, যত দীর্ঘায়ুই দেওয়া হোক।

আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন পাপীদের জাহান্নামে প্রেরণের সময় তারা আবার দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে, বলবে আল্লাহ্র ইবাদাত করে ফিরে আসবে। আল্লাহ্ এটাও বলেছেন তারা মিথ্যা বলছে, তাদের আবার দুনিয়ায় পাঠানো হলেও তারা ঐ একই পাপাচার আর কুফরি করেই আসত।

আমাদের মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ ভবিষ্যত জানেন। কে জান্নাতি হবে, আর কে জাহান্নামি হবে, এটা আল্লাহ্ আগে থেকেই জানেন। যেহেতু আল্লাহ্ জানেন কে পাপ করবে আর কে নেক আমল করবে, তাই তিনি চাইলে মানুষকে দুনিয়ায় না পাঠিয়ে সরাসরি জান্নাত বা জাহান্নামে পাঠাতে পারতেন। কিন্তু সেটা করলে জান্নাতিরা কোন আপত্তি না তুললেও জাহান্নামিরা বলত-'আল্লাহ, আমাদের তো পাপ করার সুযোগই দিলেন না, আমাদের কেন জাহান্নামে পাঠাচ্ছেন?' তাই আল্লাহ্ তাদের দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, যাতে তারা নিজ হাতে জাহান্নামকে কামাই করতে পারে আর শেষ বিচারের দিনে কোন অজুহাত দিতে না পারে।

যে হিদায়াহ পাবার যোগ্য তাকে আল্লাহ্ স্বল্পায়ু জীবনেই তা দেন আর যে পাবার যোগ্য না সে লক্ষ বছর আয়ু পেলেও পাবেনা, এটা আল্লাহ্ জানেন। সীমিত জীবনের পাপের শাস্তি অসীম হবার কারণ এটাই। আল্লাহ্ অল্প সময়ে সংক্ষিপ্ত জীবনেই তাঁর পরীক্ষাগুলো নিয়ে নেন।

৯

একটা প্রশ্ন প্রায়ই শোনা যায়। যদি এমন কোন লোক থেকে থাকে যে বাস করেছে লোকালয় থেকে অনেক দূরে; যেমন আমাজান বনের গহীনে কোন গোষ্ঠী থাকে, যাদের কাছে সত্য দ্বীনের আলো

কখনো পৌঁছেনি, তাহলে তাদের ব্যাপারে কী ফায়সালা? আবার হতে পারে শারীরিক বা মানসিক বৈকল্যের কারণে কারো পক্ষে ধর্মের কথা অনুধাবন করা সম্ভব হল না। সেক্ষেত্রে তার বিচার কী? অথচ আল্লাহ্ বলেছেনঃ

"রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি লোকেদের শাস্তি দিই না।" [আল ইসরা-১৫]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসির ইবনে কাসীরে একটি হাদীস উল্লিখিত হয়েছে, যেখানে রাসূল (সা) এ জাতীয় মানুষের বিচারের ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন। সেটা এভাবে হবে যে, বিচার দিবসে তাদের পুনরুত্থিত করা হবে সুস্থ মস্তিষ্ক এবং শারীরিক সক্ষমতাসহ। তারপর আল্লাহ্ তাদের থেকে আনুগত্যের অঙ্গীকার নেবেন এবং তাদের সম্মুখে একটি আগুনের দেওয়াল তৈরি করবেন। একজন ফেরেশতা তাদের কাছে তাওহীদের বাণী বুঝিয়ে বলবে। এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা আদিষ্ট হবে ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে। আগুনে পূর্ণ দেওয়ালের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে তারা ইতস্তত করবে।

যারা তাওহীদকে অন্তরে ধারণ করবে তারা আল্লাহর আদেশকে আগুনের ভীতির ওপর স্থান দেবে এবং আগুনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। তারা দরজার ওপারে গিয়ে দেখবে সুসজ্জিত

জান্নাত। আর যারা আগুনের ভয়ে আল্লাহর আদেশ মানবে না তারা আল্লাহ্কে একমাত্র ইলাহ মানতে পারেনি, কারণ তারা অগ্নিভীতিকে আল্লাহর আদেশের ওপর স্থান দিয়েছে। কাজেই তারা তাওহীদ মেনে চলতে না পারায় জাহান্নামী হবে। বস্তুত দুনিয়ায় যদি তাদের কাছে তাওহীদের বাণী পৌঁছে যেত তবু তারা তা লঙ্ঘন করত। আর যারা দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছে তারা দুনিয়াতেও আল্লাহ্র হুকুম মেনে চলত। এভাবে আল্লাহ্ সংক্ষিপ্ত পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের বিচার করে নেবেন।

শেষ কথাঃ আপাতত এ কয়েকটি বিষয়ে আমার সাধ্যানুসারে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছি। ভবিষ্যতে সুযোগ হলে আরো কিছু বিষয় নিয়ে লেখার ইচ্ছা আছে। আমার লেখা যদি একজন মুসলিমেরও কনফিউশন দূর করতে অবদান রাখে তবে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব। লেখাটার যা কিছু ভালো তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আর যা কিছু ভুলত্রুটি তা আমার পক্ষ থেকে।

আল্লাহ্ আমাদের অন্তরকে শিরকমুক্ত রাখুন এবং সহীহ আক্বীদার ওপর অটল থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন।

জঘন্য জাতীয়তাবাদ

একটা রিকশাওয়ালাকে আপনি যুক্তি দিয়ে কোন কথা বোঝালে সে অনেক সহজেই তাতে সায় দেবে। মাথা নেড়ে বলবে "হ, আপনি ঠিকই কইছেন।" কিন্তু একটা শিক্ষিত ডিগ্রিওয়ালা লোককে আপনি তার চেয়ে শক্তিশালী যুক্তি দেখালেও তার মেনে নিতে অনেক কষ্ট হবে, যদি সেটা তার মতের বিরুদ্ধে যায়। কেন?

এর কারণ রিকশাওয়ালাটি স্বল্পশিক্ষিত হওয়ায় তার মাথা ফিলোসফি আর নানা তত্ত্বকথার বাহুল্যে পরিপূর্ণ হয়ে যায়নি। নতুন আগত বিষয়কে সে খুব সহজেই মাথায় বসাতে পারে। কিন্তু সেক্যুলার শিক্ষিত লোকটি তার সারাজীবনের ধ্যানধারনা, আদর্শ আর থিওরি দিয়ে মগজটা ভরিয়ে রেখেছেন, নতুন কোন থিওরি বা যুক্তিকে জায়গা দেওয়াটা তার মস্তিষ্কের পক্ষে কঠিন। আরবের সাধারন লোকগুলো ইসলামের বেসিক প্রিন্সিপাল যত সহজে আয়ত্ত করেছিল আজকের শিক্ষিত সমাজ তত সহজে তা গ্রহণ করতে পারে না। এর মূলেও একই ব্যাপার।

তাওহীদের বাণীটা খুবই সহজ-সরল। কিন্তু এই সহজ সরল বাণীটা ধারন করতে হলে বাকি সব কঠিন কঠিন আদর্শ, ফিলোসফিকে বিসর্জন দিতে হয়। এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব মেনে নিলে অন্যসব তত্ত্ব আর প্রবৃত্তির দাসত্ব ছুঁড়ে ফেলতে হয়। একটা অসুস্থ

মানুষের কাছে মুখরোচক খাবার ভালো লাগে না। সেটাকে ভালো লাগানোর জন্য রোগটাকে তাড়ানোর দরকার হয়।

রোগ যদি প্রাকৃতিকভাবে হয়ে থাকে তবে তা প্রাকৃতিকভাবেই সেরে যায়। হয়তো কিছু চিকিৎসা দরকার হয়, ওষুধের জন্য কয়টা টাকা খসে। তবু যায়। তবে যে রোগ ইনজেকশন দিয়ে শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তা থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। রোগী রোগ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, জানতেও পারে না। পয়সনিং এর এফেক্ট রাতারাতি ধরা পড়ে না, তবে যখন পড়ে তখন অলরেডি সেভিয়ার কেস।

এমন এক ইনজেকশনের বিষ নিয়ে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি। বিষের নাম জাতীয়তাবাদ।

অনেকে জাতীয়তাবাদকে দেশপ্রেমের সাথে গুলিয়ে ফেলেন। দুটো দুই জিনিস। দেশপ্রেম মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। শুধু মানুষ কেন, প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে তা বর্তমান। একটা কুকুরকে বাড়ি দিয়ে তাড়িয়ে দিলে সে আবার ফিরে আসে। ফিরে আসে মনিবের টানে, ঐ জায়গাটার টানে। এটা দেশপ্রেমের সাথে তুল্য। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদ এক মানসিক রোগ, যা মানুষের মনকে সংকীর্ণ করে দেয়, সত্যের আলো টেনে নেওয়ার পথটাকে রুদ্ধ করে দেয়।

'দেশপ্রেম' বুঝতে গেলে 'দেশ' কী সেটা বোঝা দরকার। আসুন আমরা 'দেশ'কে ডিফাইন করার চেষ্টা করি।

আমি আপাদমস্তক শহুরে মানুষ। জন্মেছি ঢাকায়, বেড়ে ওঠাও এখানেই। ইট-পাথর-কংক্রিটের সাথে আজীবনের সখ্য। যেখানে আমার জন্ম, এখনো সে জায়গায় গেলে পুরনো দিনের কত স্মৃতি এসে ভীড় জমায়, কত না বলা কথা বাষ্প হয়ে আবার বুকে আসে, মিলিয়ে যায়। শিশুকালের কত ঘটনা, কত রোমাঞ্চ মিশে আছে জায়গাটাতে। সেখানকার প্রতি আমার অন্যরকম একটা ফিলিংস কাজ করবে সেটাই স্বাভাবিক। যে গ্রামে জন্মেছে তার নিজ গ্রামের আলো-বাতাস আর মাটির গন্ধ তাকে যে স্বাদ দেয়, যে অনুভূতি দেয় তা আর কোন কিছুতেই সে পাবে না। জন্মস্থানের সাথে, বেড়ে ওঠার মাটির সাথে এ এক অনন্য সখ্য প্রত্যেকের। এই সহজাত ভালোলাগা-ভালোবাসার ব্যাপারটিই দেশপ্রেম, যা হৃদয় থেকে উঠে আসে, একে বানিয়ে নিতে হয় না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে মদীনায় হিযরতের পর মুহাজির সাহাবাদের কেউ কেউ মক্কা নিয়ে কবিতা লিখতেন। রাসূল তাঁদের নিষেধ করেন নি, কারণ তিনি জানেন জন্মভূমির প্রতি এই ভালোবাসা প্রত্যেকের মজ্জাগত। তাঁর নিজেরও মক্কার প্রতি এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল। মদীনার জীবন

এই সাহাবাদের কাছে প্রবাস জীবনের মতই মনে হয়েছিল। কেননা মক্কা তাঁদের জন্মস্থান, মদীনা তো দূরদেশ।

আজকে 'সৌদি আরব' নামে বিশ্বে একটা দেশ আছে। মক্কা আর মদীনা দেশটির দুই শহর। আজকে মক্কার লোক মদীনায় থাকাকে প্রবাস জ্ঞান করবে না। কারণ উভয় জায়গা ই সৌদি আরবের 'সীমানা'র মধ্যে। উভয়ই একই 'দেশ'। মানে 'দেশ' কোনটা আর 'প্রবাস' কোনটা সেটা নির্ধারণ করছে জন্ম নয়, বরং বেঁধে দেওয়া এক সীমানা। অদ্ভুত ব্যাপার।

আরো সহজ করে বলি। সাতচল্লিশের আগে কলকাতা আমাদের 'দেশ' ছিল। তখনো পাকিস্তান হয়নি। পাকিস্তান হবার পর কলকাতা হয়ে গেল 'বিদেশ', অথচ কলকাতার চেয়ে বহুদূরের করাচি হয়ে গেল 'দেশ'!! একাত্তরের পর আবার কলকাতাও বিদেশ, করাচিও বিদেশ। আজকে সিলেট-চট্টগ্রাম আমাদের 'দেশ', কে বলতে পারে, হয়তো পঞ্চাশ বছর পর এগুলো আলাদা হয়ে যাবে। তখন সিলেটবাসীকে বলব 'বিদেশী।' আবার উল্টোটাও হতে পারে। হয়তো ভারত-পাকিস্তান ইউনিফাইড হয়ে গেল। দুদিন আগে যারা ছিল 'বিদেশী', তারা হয়ে যাবে 'দেশী', তারা হয়ে যাবে ভাই!!

কাজেই সীমানা দিয়ে 'দেশ', 'বিদেশ' নির্ধারণের প্রক্রিয়াটা উদ্ভট এবং হাস্যকর। আপনি নিজের জন্মস্থান পাল্টাতে পারবেন না, ওটা স্থায়ী। ওটাই আপনার জন্মভূমি, ওটাই আপনার 'দেশ।' এর বাইরে যা কিছু আছে তার সবই এক, তাদের মধ্যে পৃথিকীকরণের গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড আপনি পাবেন না।

আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে ফ্যালাসিটা তুলে ধরি। আমরা সবাই বইয়ে পড়ি একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। বটে?? 'দেশ' তো তখনো ছিল পাকিস্তান !! বাংলাদেশের তো জন্মই হয় নি !! তাহলে 'দেশপ্রেম' মানে পাকিস্তানপ্রেম হওয়ার কথা, বাংলাদেশপ্রেম হয় কীভাবে??

এ কথা উঠলে আবার বলা হবে সীমানা অনুযায়ী 'দেশ' পাকিস্তান হলেও আমাদের 'বাঙ্গালিদের' 'দেশ' ছিল পূর্ব বাংলা। সেক্ষেত্রে আবার প্রশ্ন ওঠে, বাঙ্গালিরা তো পশ্চিমবঙ্গেও আছে, সেটা তবে 'বিদেশ' হয় কীভাবে?? তখন বলা হবে, মানে এ অঞ্চলের বাঙ্গালিদের 'জন্মভূমি' ছিল পূর্ব বাংলা। তারা জন্মভূমির হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন।

ওই তো। শেষ পর্যন্ত জন্মভূমিতেই ফিরে যাওয়া লাগবে। দেশীয় সীমানা, ভাষাগত ঐক্য, কোনকিছুই 'দেশ' কে ডিফাইন করতে

পারেনা। কেন পারেনা, সেটাই এতক্ষণ আলোচনার চেষ্টা করেছি। আশা করি বোঝাতে পেরেছি।

আমি ঢাকায় জন্মেছি, ঢাকা আমার জন্মভুমি। এখানে আমার নাড়ি পোঁতা। সিলেট আমার জন্মভূমি না। আমি সিলেট-কলকাতার পার্থক্য করি না। বৃটিশদের বেঁধে দেওয়া কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে আমি মানুষের পার্থক্য করি না। আমার আত্মমর্যাদায় লাগে।

২

জাতীয়তাবাদ কী?

জাতীয়তাবাদ মানে মানবতাকে কাঁটাতারের বেড়ায় আবদ্ধ করে ফেলা। জাতীয়তাবাদ মানে সীমানার এপারের মাটি 'সোনা', আর ওপারের মাটি কেবলই মাটি। জাতীয়তাবাদ মানে বৃটিশদের তৈরি করে দেওয়া সীমানা নিয়ে গৌরব করা।

বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে একটা মন্দির ভাঙ্গা হলে আমাদের কীবোর্ডে ঝড় উঠে যাবে। সংখ্যালঘু নির্যাতন, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ বর্ডারের ওপারে মায়ানমারে মুসলিমদের ওপর ধ্বংসযজ্ঞ চলছে, তাদের রক্ত দিয়ে স্নান করছে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা, আরাকানে মুসলিমদের ওপর গণহত্যা চলছে, কাশ্মীরে

পুলিশ গুলি করে মারছে মুসলিমদের, পাকিস্তানে আমেরিকা ড্রোন হামলা করে নিরীহ নারী-শিশুদের মারছে, এসব ক্ষেত্রে আমাদের মুখে ফেভিকলের কুলুপ। কারণ নির্যাতিতরা 'বার্মিজ', 'ভারতীয়', 'পাকিস্তানী।' আমার মানবতা বর্ডারের এপারের জন্য, ওপারের লোককে মানুষ হিসেবে কাউন্ট করিনা। এটাই জাতীয়তাবাদ।

জাতীয়তাবাদ মানে স্বজাতির প্রতি পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। নিজের জাতি অন্যায় করলেও তা না দেখার ভান করা। সে আমার 'দেশী' বলে। জাতীয়তাবাদ মানে সত্যের ওপর সীমানার সম্পর্ককে প্রাধান্য দেওয়া।

ফেলানী নামের একটা মেয়ে সীমান্তে নিহত হল। তাকে নিয়ে হৈচৈ পড়ে গেল। কয়েকবছর পর ২০১৩ তে হত্যার বিচার বসল। প্রহসনের রায়ে হত্যাকারী ভারতীয় সেনা বেকসুর খালাস পেল। আমরা নিন্দা জানালাম। আর ভারতীয়রা বলল ন্যায়বিচার হয়েছে।

এটাই জাতীয়তাবাদ। ভারতীয়রা ভারতের সেনার দোষ দেখবে না। সে ভারতীয়?? অতএব সাতখুন মাফ। ভারতের জায়গায় আমরা থাকলে একই কাজ করতাম। মনে আছে, ২০১১ সালে সৌদি আরবে খুনের দায়ে ৮ বাংলাদেশীর শিরচ্ছেদ হল?? সে কী ঝড় এদেশে!! স্পষ্ট অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পরও তাদের মৃত্যুদন্ড দেওয়া নিয়ে সৌদি আরবের মুণ্ডুপাত করা হল। এমনকি

আসামীদের কাজকে জাস্টিফাই করতেও কত লেখালেখি হয়েছে। কেন ?? কারণ আসামীরা বাংলাদেশী। তারা খুন করুক আর যা ই করুক, অন্যদেশ তাদের বিচার করতে পারবে না- এই মনোভাবটাই জাতীয়তাবাদ।

আরো সহজ উদাহরণ দিই। কদিন আগে সাকিব আল হাসান গ্যালারিতে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করেছিল। প্রথমে সমালোচনার ঝড় উঠল। সে নিষিদ্ধ হল। এরপর আমরাই আবার "লঘুপাপে গুরুদণ্ড হয়েছে" বলে মাতম তুললাম। "সাকিবকে ফিরিয়ে আনো" বলে কত হাহাকার, কত ইভেন্ট খোলা। সাকিবের কাছাকাছি কোন আচরণ যদি বিরাট কোহলি বা শহীদ আফ্রিদি করত তাহলে আমরা কি এ কথা বলতাম?? গালি দিয়ে তাদের চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার করতাম না?? আজীবন নিষিদ্ধের দাবি তুলতাম না?? ভারতীয় বা পাকিস্তানী ফ্যানদের পচানোর জন্য আজীবনের উপকরণ পেয়ে যেতাম না?? অথচ সাকিবের ব্যাপারে আমরা কত সহনশীল। কারণ সে আমার 'দেশী।' এটাই জাতীয়তাবাদ।

এবার আরো গুরুতর প্রসঙ্গে যাচ্ছি। অনেকের বুকে চোট লাগতে পারে। তিক্ত সত্য হজম করার ক্ষমতা সবার নেই। তবু আমাকে বলতেই হবে।

একাত্তরে পাকিস্তানী আর্মি যে গণহত্যা আর নির্যাতন চালিয়েছে তাকে জাস্টিফাই করার কোন উপায় নেই। তবে অপরাধ যে কেবল একপাক্ষিক ছিল তা নয়। কুতুবউদ্দীন আজীজের "Blood and Tears" কিংবা শর্মিলা বসুর "Dead Reckoning" [i] জাতীয় বইগুলোতে আমরা ইতিহাসের উল্টোপিঠটাও পাই। মুক্তিযোদ্ধাদের দল বিহারীদের ওপর যে হত্যা আর ধর্ষণ চালিয়েছিল তা আমরা প্রচলিত ইতিহাসের কোন বইয়ে খুঁজে পাব না। যুদ্ধের পরে অস্ত্র থাকা যোদ্ধাদের অনেকে যে অস্ত্র জমা না দিয়ে ডাকাতিসহ বিভিন্ন কাজে লিপ্ত হয়েছিল তা আমরা এক জেনারেশন আগের মানুষের কাছে শুনি, কিন্তু কোন বইয়ে দেখিনা। কেন?? কারণ ইতিহাস লেখে বিজয়ীরা। বাঙ্গালিদের লেখা বইয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নিষ্পাপ হিসেবে তুলে ধরা হবে এটাই জাতীয়তাবাদের দাবি। এটা ঠিক যে এদেশের কৃষক-শ্রমিকসহ অসংখ্য গরিব মানুষ শোষণ থেকে মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু যোদ্ধাদের সবাই স্বার্থহীনভাবে কাজ করেছেন এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই। কিন্তু জাতীয়তাবাদ আমাদের এমনটা ভাবতে বাধ্য করে।

জাতীয়তাবাদ একপাক্ষিক না। পাকিস্তানের ইতিহাস বইগুলোতে ওদের আর্মিকে বীর হিসেবে তুলে ধরা হয়। তাদের দোষকে, গণহত্যাকে উপেক্ষা করা হয়। বাঙ্গালিদের ওপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয়। এদেশের লোককে "বিদ্রোহী", "দেশদ্রোহী" হিসেবে তুলে ধরা হয়। আমরা বড় হই পাকিস্তানীদের ঘৃণার চোখে দেখে,

ওরা বড় হয় আমাদের ঘৃণার চোখে দেখে। আমরা পাকিস্তানকে 'Fuckistan' বলতে পেরে সুখলাভ করি, ওরাও আমাদের গালি দিয়ে পরম আনন্দ লাভ করে। এটাই জাতীয়তাবাদের স্বরূপ।

একাত্তরের যুদ্ধকে আমরা দেখি স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবে, পাকিস্তানীরা দেখে দেশদ্রোহীদের দমনে সেনাবাহিনীর অভিযান হিসেবে, আর ভারতীয়রা দেখে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের জয় হিসেবে। জাতীয়াবাদ আমাদের ন্যায়, চিন্তাশক্তি আর বিবেককে ধ্বংস করে দেয়। পক্ষপাত আর ঘৃণাই হল জাতীয়াতাবাদের আউটপুট। এ সেই পচন ধরা মতবাদ যা প্রত্যেককে ভাবতে শেখায়-তার নিজের দেশ, নিজের জাতিই শ্রেষ্ঠ। তার জাতির ইতিহাস সবচেয়ে গৌরবান্বিত, সবচেয়ে নিষ্কলঙ্ক। ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা বিচারের ভার বিবেক থেকে এমনিতেই চলে যায় জাতীয়তাবাদের হাতে।

এই সেই জাতীয়তাবাদ যার কারণে মানুষ নিজেকে কেবল বিশেষ জাতিতে জন্ম বলে দম্ভ করতে শেখায়। এক ব্যক্তি এশিয়ার অধিবাসী বলে ইউরোপ বা আমেরিকাবাসীদের নিকট ঘৃণিত, অত্যাচারিত, নিষ্পেষিত ও অধিকার বঞ্চিত হতে একান্তভাবে বাধ্য। এক ব্যক্তি শুধু কৃষ্ণাঙ্গ হওয়াই শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির দৃষ্টিতে তার ঘৃণিত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। সাদা-কালোর প্রভেদের মূলে এই জাত্যাভিমান, জাতীয়তার দম্ভ। নিগ্রোদেরকে জীবন্ত দগ্ধীভূত করা আমেরিকার সভ্য নাগরিকদের পক্ষে কিছুমাত্র অপরাধের কাজ নয়,

কারণ তারা নিগ্রো। জার্মান জাতি এবং ফরাসী জাতি পরস্পরকে ঘৃণা করতে পারে কারণ তারা দুটি স্বতন্ত্র জাতিতে বিভক্ত। এদের একজনের গুণাবলী অন্যের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ দোষ ও ত্রুটি বলে নিরূপিত হয়। সীমান্তের স্বাধীন আফগানীদের আফগানী হওয়া এবং দামেশকের অধিবাসীদের আরব জাতির অন্তর্ভূক্ত হওয়া এমন একটা অপরাধ যে, কেবল এ কারণেই তাদের মাথার উপর বোমারু বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপ করা এবং সে দেশের জনগণকে পাইকারীহারে হত্যা করা ইংরেজ ও ফরাসীদের পক্ষে একেবারে ন্যায়সংগত। কিন্তু ইউরোপের সুসভ্য (?) অধিবাসীদের উপর এরূপ বোমা নিক্ষেপ করাকে বর্বরতামূলক কাজ বলে তারা মনে করে।

হিটালার-মুসোলিনিরা জাতীয়তাবাদের গর্বে অন্ধ হয়ে মানুষহত্যাকে জায়েয করেছিল। আমাদের দুশো বছরের প্রভুরা নীলচাষীদের পেটে লাথি মেরে হত্যাকে বৈধ ভাবত কারণ নীলচাষীরা 'নিচুজাতি', আর বৃটিশরা 'উঁচু জাতি।' এই জাতীয়তাবাদ এনেছে যুদ্ধ, এনেছে অনর্থ, কেড়ে নিয়েছে লক্ষ লক্ষ প্রাণ, বয়ে এনেছে দাম্ভিকতা, ঘৃণা আর মজলুমের কান্না।
এই নোংরা বিষাক্ত বস্তুকে না ছাড়তে পারলে আত্মার মৃত্যু সুনিশ্চিত।

ইসলাম জাতীয়তাবাদের মত নোংরা মতবাদকে সমূলে প্রত্যাখ্যান করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন--

“সে আমাদের দলভুক্ত নয় যে আসাবিয়্যাহর (জাতীয়তাবাদ) দিকে ডাক দেয়, বা আসাবিয়্যাহর কারণে লড়াই করে কিংবা আসাবিয়্যাহর কারণে মৃত্যুবরণ করে” [আবু দাউদ-৫১২১]

তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল, "আসাবিয়্যাহ কী?" তিনি উত্তরে বললেন, "আসাবিয়্যাহ হলো অন্যায়-অবিচার ও জুলুমের ক্ষেত্রে তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সহযোগিতা করবে।" [আবু দাউদ-৫১১৯]

এখানে উল্লেখ্য, স্বহস্তে সহযোগিতা না করে সমর্থন দেওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত, যেমনটা আমরা পূর্বের অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছি। অপর এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেন--

"যে জাতীয়তাবাদ তথা আসোবিয়্যাহর জাহেলী আহবানের দিকে মানুষকে ডাকে সে যেন তার পিতার লজ্জাস্থান কামড়ে ধরে পড়ে আছে (তাকে ছাড়তে চাইছে না)।" এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "এবং একথাটি লুকিয়ে রেখো না (অর্থাৎ বলার ক্ষেত্রে কোনো লজ্জা বা অস্বস্তিবোধ করোনা)।" [মুসনাদে আহমাদ - ২১২৩৬]

একটু চিন্তা করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কথার মাধুর্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর বক্তব্য শ্রোতাদের মোহিত করে ফেলত, যা শুনে বহু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই মানুষটি কোনদিন কাউকে গালি দেবেন বা খারাপ ভাষা ব্যবহার করবেন, চিন্তা করা যায়?? অথচ তিনি এখানে তুলনা দিলেন "পিতার লজ্জাস্থান কামড়ে ধরা"র সাথে। এটুকুতেই স্পষ্ট, কতবড় নোংরা জিনিস এই জাতীয়তাবাদ, যার তুলনা দিতে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) পর্যন্ত এর চেয়ে ভালো শব্দ খুঁজে পান নি!!

ইসলাম কেন জাতীয়বাদকে প্রত্যাখ্যান করে?? কয়েকটি দিক আলোচনা করছি।

প্রথমত, জাতীয়তাবাদের কারণে ইসলামের একটি মূলনীতি "আল ওয়ালা ওয়াল বারাহ" [ii] সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘিত হয়। "আল ওয়ালা ওয়াল বারাহ" অর্থ আল্লাহ্‌র জন্যই ভালোবাসা আর আল্লাহ্‌র জন্যই ঘৃণা। একজন মুসলিমের প্রতি আরেকজন মুসলিমের ভালোবাসা থাকতে হবে আল্লাহ্‌র জন্যই। কোন পার্থিব স্বার্থের জন্য নয়। যে কালিমা পড়েছে, সে মুসলিম, সে আমার ভাই, পৃথিবীর যে প্রান্তেরই হোক না কেন। আমার ওপর তার হক্ব আছে। আর যারা ইসলামের সাথে দুশমনি করে, তারা যত কাছের লোকই হোক না কেন, তার সাথে আমার সম্পর্ক নেই। এটাই আল ওয়ালা ওয়াল

বারাহ। অর্থাৎ ভালোবাসা ও শত্রুতা-কেবল আল্লাহরই জন্য। কিন্তু জাতীয়তাবাদ মুসলিমদের এই সম্পর্কের মধ্যে দেয়াল গড়ে দেয়। ভিনদেশের মুসলিমকে তখন আপন ভাবা যায়না, আবার নিজদেশের আল্লাহদ্রোহীর প্রতিও সহানুভূতি চলে আসে।

রাসূল (সা) আরবের লোক ছিলেন, তাঁর ভাষা ছিল আরবী। ওয়াল্লাহি, জাতীয়তাবাদ থেকে মুক্ত না হতে পারলে আপনি কখনোই রাসূল (স) কে সেভাবে ভালোবাসতে পারবেন না, যেভাবে ভালোবাসা উচিত। অথচ রাসূল (সা) কে নিজের সম্পদ, পরিবার এমনকি জীবন থেকেও বেশি প্রিয় না হলে আপনি পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবেন না। জাতীয়তাবাদ এমনি আপনার আর ঈমানের মাঝে বাধা হয়ে থাকবে।

দ্বিতীয়ত, মুসলিম উম্মাহর Universal Brotherhood ধ্বংস করে জাতীয়তাবাদ। রাসূল (সা) বলেছেন--

"সমগ্র উম্মাহ একটি দেহের মত। যদি দেহের এক অংশে ব্যাথা অনুভূত হয়, তাহলে দেহের অন্যান্য অংশ তাতে আক্রান্ত হয়" [মুসলিম]

অর্থাৎ পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে একজন মুসলিমের কষ্টে সমস্ত মুসলিমের ব্যথা লাগবে। এটাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য। অথচ

জাতীয়তাবাদ আমাদের সেই অনুভূতি নষ্ট করে দিয়েছে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে একবার খবর এল সিন্ধু প্রদেশে একজন মুসলিম নারী অপমানিত হয়েছেন। সাথে সাথে তিনি মুহাম্মাদ বিন কাসিমকে সেনাবাহিনীসহ পাঠালেন সিন্ধু জয় করতে। এতটাই প্রবল ছিল উম্মাহর প্রতি ফিলিংস। বিশ্বের কোন একপ্রান্তে একজন মুসলিমের কান্নার আওয়াজ আমীরুল মু'মিনিনের রাতের ঘুম হারাম করে দিত। আর আজ লক্ষ মুসলিমের রক্তে রঞ্জিত ওবামার সাথে হাত মেলায় মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান। টাকার কাছে, জাতীয়তাবাদের কাছে আমাদের সব মানবতা, সব দায়িত্ব বিসর্জন দিয়ে ফেলেছি।

একজন মুসলিম, সে বিশ্বের যে প্রান্তেরই হোক, আমার ভাই। একজন বাংলাদেশি আমার ভাই, তদ্রুপ একজন পাকিস্তানি, ভারতীয়, আফ্রিকান, সিরিয়ান, আরব বা আমেরিকান মুসলিমও আমার ভাই। কিন্তু জাতীয়তাবাদ এই ভাতৃত্বকে অস্বীকার করে। সে শেখায় পাকিস্তানী সৈন্য আমাদের অত্যাচার করেছে, অতএব পাকিস্তানের সব মানুষ আমাদের শত্রু। তাদের ঘৃণা করতে হবে। অথচ বৃটিশরা দুশো বছর অত্যাচার করলেও তাদের গোলামি করতে আমাদের বাধেনা। তাদের পোশাক, ভাষা ইউজ করলে ভাবি জাতে উঠে গেছি। জাতীয়তাবাদ এমনই অন্ধ, এমনই বিকৃত।

আজকে আফিয়া-ফাতিমারা কুফফারদের কারাগারে রক্ত দিয়ে চিঠি লেখে, মুসলিম বিশ্বে মজলুমের হাহাকারে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত, লক্ষ লক্ষ শিশু জবাই হচ্ছে, মা-বোনদের ধর্ষণ করা হচ্ছে, ভাইদের গুলি করে বুক ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে, কে তাদের চিৎকার শুনবে?? কে হবে খালিদ, কে হবে তারিক, কে হবে আব্দুর রহমান, কে হবে সালাউদ্দীন আয়্যুবী?? মুসলিম যুবকেরা আজ ব্যস্ত মেসি-মেইমার আর গার্লফ্রেন্ড নিয়ে, মা-বোনদের চিৎকার শোনার সময় তাদের হয়না। সিরিয়ায় হামলা হয়েছে, আমি তো বাংলাদেশি ! বার্মায় হত্যাযজ্ঞ চলছে, আরে আমি তো বাংলাদেশি!! আমার কী এসে যায়?? এটাই জাতীয়তাবাদের স্বরূপ।

রাসূল (সা) বলেছেন সে ব্যক্তি মুসলিমদের দলভুক্ত নয় যে রাতে ঘুমাতে যায় অথচ উম্মাহর কথা চিন্তা করেনা। আজকে একটু চিন্তা করলেই দেখি, কত মুসলিমের কান্নার দায় আমরা বহন করছি। আমরা সাক্ষী হয়েছি বসনিয়ার গণহত্যায় নিহত হাজার হাজার মুসলিমের, ধর্ষিতা মা-বোনের। আমরা সাক্ষী হয়েছি গুজরাটের গণহত্যায় নিহত তিন হাজার মুসলিমের লাশের। আমরা সাক্ষী আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া আর মিশরের লক্ষ মুসলিমের কান্না আর লক্ষ শিশুর আর্তনাদের। আমরা সাক্ষী হয়েছি পাকিস্তানের ড্রোন হামলায় বিধ্বস্ত মুসলিম জনপদের। কী ভাবছেন? তাদের ব্যাপারে আমরা জিজ্ঞাসিত হব না? তাদের জন্য আমরা কী করেছি, এটা আমাদের জবাব দিতে হবে না? আমরা কী জবাব দেব সেদিন

যখন আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে সেব্রেনিকায় ধর্ষিতা হয়ে মারা যাওয়া একটি বোন? কী জবাব দেব যখন আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে ইরাকের একটি শিশু? সে যদি এই কাপুরুষ মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে, আমাদের কোন উপায় থাকবে কি?

না থাকবে না। জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে সেদিন রেহাই পাওয়া যাবে না। "ও তো ভিনদেশের লোক" বলে দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে সেদিন নিস্তার নেই।

তৃতীয়ত, জাতীয়তাবাদ নিজের জাতিকে অন্য জাতি থেকে শ্রেষ্ঠ ভাবতে শেখায়, যা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন--

"লোকেদের উচিত হল তারা যেন তাদের জাতি নিয়ে গর্ব করা ত্যাগ করে, কারণ তা জাহান্নামের আগুনের কয়লাগুলোর মধ্যে একটি কয়লা। যদি তারা তা পরিত্যাগ না করে তবে আল্লাহ্ তাদেরকে সেই নিচু কীটগুলো থেকেও নীচ করে দেবেন যারা মল-বর্জ্যের মধ্যে নিজেরাই নিজেদের ঠেলে দেয়।" [আবু দাঊদ, তিরমিযী]

ইসলামে জাত্যাভিমান বা বংশমর্যাদার গৌরব চরম নিন্দনীয়। রাসূলুল্লাহ (সা) এই ব্যাপারগুলোকে জাহেলী যুগের কর্ম বলে উল্লেখ করেছেন। ইসলামে মানুষের সম্মানের মানদন্ড তার তাকওয়ায়, এখানে গায়ের রঙ, বংশ, জাতি, ভাষা-এসবই মূল্যহীন। নিগ্রো কৃতদাস বিলাল (রা) এর সম্মান কত বেশি সে কথা আমরা জানি। তাঁর জাতি ছিল সমাজে একেবারেই ঘৃণিত। আবার তৎকালীন আরবের উচ্চবংশ বলে পরিচিত কুরাইশ বংশের আবু জাহেল, আবু লাহাবরা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাদের জাতি তাদের মর্যাদা দিতে পারেনি।

"হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।" [হুজুরাতঃ ১৩]

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে সম্মানের মাপকাঠি কোন জাতীয়তা নয়, বরং তাকওয়া এবং সৎকর্ম। কে কোথায় জন্মেছে সেটার কোন দাম নেই এখানে। পুরো পৃথিবী আল্লাহ্‌ তা'আলার সৃষ্টি। কোন মাটিকে ঘৃণা করার অবকাশ নেই। আমি জন্মেছি বলে সে মাটি পাক, আর আমার শত্রু জন্মেছে সে মাটি নাপাক, এমনটা মনে করার কোন অবকাশ ইসলাম দেয় নি।

রাসূল (সা) বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলেছেন, আরবের ওপর অনারবের কিংবা অনারবের ওপর আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এই একটা বাক্য দিয়েই জাতীয়তাবাদের গর্বকে ধুলিস্মাৎ করে ফেলা হল। অথচ আমাদের মাথায় ছেলেবেলা থেকে গেঁথে দেওয়া হয়, নিজের ভূমি, নিজের দেশ, নিজের ভাষা আর নিজের জাতি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জর্জ বার্নার্ড শ ব্যাপারটিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন এভাবেঃ

"দেশপ্রেম হল এমন একটা বিশ্বাস বা ধারনা যে তোমার দেশ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ তুমি সেখানে জন্মেছ।"

এখানে 'দেশপ্রেম' বলতে তিনি জাতীয়তাবাদকেই বুঝিয়েছেন। কথাটির যথার্থতা সহজেই বোঝা যায়। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের জাতীয় সঙ্গীত এমনভাবে লেখা হয় যেন সে দেশটিই জগতের সেরা। আমরা যেমন আমাদের দেশকে "সকল দেশের রাণী" ভাবতে শিখি। অথচ এদেশের সাথে আমার সম্পর্ক এতটুকুই যে আমি এখানে জন্মেছি। আমি মিশরে জন্মালে মিশরকে সকল দেশের সেরা বলতাম, আমেরিকায় জন্মালে সেটা হত সেরা দেশ, ফিলিপাইনে জন্মালে বলতাম এটাই সকল দেশের রাণী।

চতুর্থত, জাতীয়তাবাদ সত্যকে অস্বীকার করতে শেখায়।

রাসূল (সা) যখন নিজেকে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ বলে দাবি করলেন, কুরাইশদের গোত্রগুলোর মধ্যে বিভেদ লেগে গেল। কেননা যদি তিনি সত্য নবী হয়ে থাকেন তবে যে গোত্রে তাঁর জন্ম তার সম্মান অনেক বেড়ে যাবে। অথচ রাসূল (সা) এসেছেন সমস্ত সৃষ্টিকুলের জন্য। তিনি আমাদের সবার গর্ব। কুরাইশরা জাতীয়তাবাদের কারণে তর্কে লিপ্ত হল। এরপর তারা বলতে লাগল তিনি সত্য নবী হতে পারেন না, কেননা কুরাইশদের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের রেখে আল্লাহ্‌ কেন একজন সাধারন যুবকের ওপর কুরআন নাযিল করবেন ! আল্লাহ্‌ ব্যাপারটিকে বর্ণনা করেন এভাবেঃ

"তারা বলে, কোরআন কেন দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হল না?" [যুখরুফঃ ৩১]

একই ভুল করেছিল ইহুদি আর খ্রিস্টানরা। মূসা (আ) মুহাম্মাদ (সা) এর ভবিষ্যতবানী তাঁর উম্মাতকে শুনিয়েছিলেন, যেটা ছিল তাওরাত কিতাবে। তাই ইহুদিরা রাসূল (সা) এর আগমনের অপেক্ষা করছিল। অথচ যখন তিনি সত্যিই এলেন, তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল। কারণ তাদের ধারনা ছিল রাসূল (সা) হবেন বনী ইসরাঈলের একজন, অথচ তিনি ইসমাঈল (আ) এর বংশধারার রাসূল। শুধুমাত্র জাতিগত দাম্ভিকতা ইহুদিদের সত্য থেকে বিরত রাখল।

একই কথা খৃস্টানদের জন্য প্রযোজ্য। বাইবেলে আছে মূসা বলেন, "He (Muhammad) will be from our brothers." এখানে তিনি "Brother" বলতে বুঝিয়েছেন বনী ইসমাঈলকে, কারণ বনী ইসরাঈলের ভাই হচ্ছে বনী ইসমাঈল। অথচ পাদ্রীরা বাইবেলের এ কথাটিকে পরিবর্তন করে লিখেছে "From our 'own' brothers" এই 'own' কথাটা তারা নিজেরা ঢুকিয়েছে, যেন মনে হয় একই বংশ থেকে শেষ নবী আসবে, আর এজন্য খৃস্টানরা ধরে নিয়েছে মুহাম্মাদ (সা) আসবেন বনী ইসরাঈল থেকেই। পরবর্তীতে তাঁকে সত্য নবী মেনে নিতে এই জাতিগত বিদ্বেষ তাদের বাধা দিয়েছে।
এইভাবে যুগে যুগে সত্যকে স্বীকার করে নিতে জাতীয়াতাবাদ দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পঞ্চমত, জাতীয়তাবাদ ন্যায়-অন্যায় বোধকে নষ্ট করে দেয়। আদলকে ধ্বংস করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা) একবার চুরির অপরাধে একবার এক কুরাইশ মহিলার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। মহিলাটি রাসূলের বংশের হওয়ায় তার শাস্তি লঘু করার সুপারিশ এল। ক্রোধে লাল হয়ে রাসূল (স) বললেন,

"আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করত, আমি তারও হাত কেটে দিতাম। এই ন্যায়বিচারের অভাবেই পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে।"

জাতীয়তাবাদের দাবি ছিল রাসূল নিজের জাতিকে ন্যায়বিচারের উপরে স্থান দেবেন। আর ইসলামের দাবি হচ্ছে অপরাধ যে ই করুক, এমনকি নিজের ভাই বা সন্তান হোক, তার শাস্তি পেতে হবে। আলী (রা) যখন খলিফা তখন এক ইহুদির কাছে মামলা হেরে যান, কেবলমাত্র সাক্ষীর অভাবে। তিনি তা নির্দ্বিধায় মেনে নেন। অর্ধজাহানের শাহানশাহ মামলা হারলেন এক সাধারণ ইহুদির কাছে, এই দৃষ্টান্ত একমাত্র ইসলামী বিচারে সম্ভব। জাতীয়তাবাদ এই ন্যায়বোধের শিকড়ে পদাঘাত করে।

একাত্তরে যারা পাকিস্তানি আর্মিকে অপকর্মে সাহায্য করেছিল তারাও জাতীয়তাবাদের বশেই করেছিল। জাতীয়তাবাদের দাবিই হল নিজের স্বজাতিকে সাহায্য করে, যদি সে অন্যায় করে তবুও। আজকে যারা যুদ্ধের অনেক পরে জন্ম নেওয়া পাকিস্তানি লোকটিকে ঘৃণা করছি শুধুমাত্র সে "পাকিস্তানি" বলে, তারাও জাতীয়তাবাদে আক্রান্ত। আমরা রাজাকারের বিচার চাই সেক্যুলারদের কাছে। আমি আজকে সেসব লোককে বলতে চাই, যদি দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকত তবে একাত্তরে না হলেও বাহাত্তরেই যুদ্ধাপরাধের বিচার হয়ে যেত। একদিন এরা

বুঝতে পারবে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দাবি করে কতবড় ভুল করেছিল। জাতীয়তাবাদী ভণ্ডের দলের কাছে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার চেয়ে কতবড় বোকামি করেছে। ভণ্ডের দল কোন ভণ্ডামির বিচার করবে বলতে পারেন?

স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব, অন্যায়, দুর্নীতি, অন্ধত্ব সব এই জাতীয়তাবাদের হাত ধরে আসে। এই বিষাক্ত বৃক্ষের মূল উপড়ে ফেলতে হবে।

শেষ কথাঃ আমরা মুসলিম, এটাই আমাদের প্রধান পরিচয়। হ্যাঁ, আমরা একইসাথে বাঙালি, বাংলাদেশী, সেসব আমাদের অবস্থান, ভাষা ইত্যাদি নির্দেশ করে, কোন সমস্যা নেই। কিন্তু আমাদের মানবতা, আমাদের হৃদয়ের আবেগ কোন কাঁটাতারের বেড়ায় আবদ্ধ নয়। পৃথিবীর সব মুসলিম আমাদের ভাই, আমাদের প্রাণ কাঁদে তাদের কষ্টে। জাতীয়তাবাদ এক বিষাক্ত মতবাদ, যা মানুষের রক্তের চেয়ে একটা কাগজের পতাকাকে বেশি মূল্যবান করে তোলে। সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা ইনজেকশনের মত এই বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে মানুষের শরীরে, অন্তরে, মগজে। সেই জাতীয়তাবাদ যা একটা পাথরের স্তম্ভতে ফুল নিবেদনকে পুণ্য জ্ঞান করায়, অথচ দেশের মানুষের স্বার্থবিরোধী চুক্তি হলে দেখেও না দেখার ভান করে পলিটিকাল ভিউ I hate politics লিখে মুড়ি চিবোতে শেখায়। সেই জাতীয়তাবাদ, যা হৃদয়কে করে সংকীর্ণ, চোখকে

করে অন্ধ, কানকে করে স্তব্ধ। সেই জাতীয়তাবাদ যা মুসলিম পরিচয়ের চেয়ে সীমানার পরিচয়কে বড় ভাবতে শেখায়। আমরা জন্মেছি মুসলিম পরিচয়ে, মৃত্যু হবে (ইনশাআল্লাহ্) এই পরিচয়ে, হাশরের ময়দানে উঠতে হবে এই পরিচয়ে। সেখানে অন্য কোন পরিচয় কাজে আসবে না, রাসূলের উম্মাত বলে নিজেকে পরিচয় দিতে না পারলে। জাতীয়তাবাদী সঙ্কীর্ণতা সেদিন ধূলিস্মাত হয়ে যাবে, অগ্নির গহ্বরে কোথায় মিলিয়ে যাবে।

এখনও কি সময় আসেনি এই বিষকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার??

টিকাঃ

i) Blood and Tears:
http://www.scribd.com/doc/28983123/Blood-and-Tears-by-Qutubuddin-Aziz

Dead Reckoning:
https://www.scribd.com/doc/254778721/Dead-Reckoning-Memories-of-the-1971-Bangladesh-War-By-Sarmila-Bose

ii) ‘আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা’ র অর্থ:

ওয়ালা অর্থ : হৃদ্যতা, বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতা। বারা অর্থ: ঘৃণা, শত্রুতা, দূরত্ব। মূলত: ওয়ালা এবং বারা হচ্ছে মনের বিষয়। ওয়ালা বা বন্ধুত্ব আল্লাহ তা'আলা, তার রাসুল সা. এবং মুমিনদের জন্য হয়ে থাকে— সেক্ষেত্রে সূরা মায়িদার ৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন , "নিশ্চয় তোমাদের বন্ধু হল আল্লাহ, তার রাসুল এবং যারা ঈমানদার"। "আল ওয়ালা ওয়াল বারাহ্" এর ভিত্তিতে পুরো মানবজাতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

- যাদেরকে খালেসভাবে ভালোবাসতে হবে:

এরা হলেন নবী-রাসূল, সিদ্দীকিন, সালেহীন এবং শুহাদা তাঁদের ঈমানের কোন ত্রুটি নাই। এর সর্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থান করছেন মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (সা) যাকে দুনিয়ার সব কিছু থেকে বেশী ভালোবাসতে হবে।

- যাদের সাথে খালেস দুশমনি ও শত্রুতা রাখতে হবে:

খাঁটি কাফের, মুনাফিক, মুশরিক, মুরতাদ, নাস্তিক এবং অনুরূপ লোক। যাদের সাথে দুশমনি করার কোন বিকল্প নাই।

- যাদের ঈমানের কারণে মুহাব্বাত করতে হবে এবং গুনাহের কারণে ঘৃণা করতে হবে:

এসব লোক হল তারা যারা ঈমান এনেছে, আবার পাপকাজেও লিপ্ত। গুনাহগার মুসলিমরা। তাদের ঈমানের কারণে তাদের প্রতি ভালোবাসা থাকবে আর গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারনে থাকবে ঘৃণা। এখানে একটা বিষয় বুঝতে হবে যে, কাফেরদের প্রতি বিদ্বেষ কিংবা শত্রুতা যেমন চিরন্তন, এদের বেলায় কিন্তু তা এরকম নয়। এদের প্রতি বিদ্বেষ হলো তাদের গুনাহের কারণে।

উল্লেখ্য, কাফেরদের মধ্যে যারা মুমিনদের কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকে, কাফেরদের সাথী হয়ে যুদ্ধ করে না, এই ধরনের কাফেরদের সাথে সদাচরণ এবং ইনসাফভিত্তিক আচরণ করতে হবে। তবে কোনভাবেই তাদের প্রতি ভালোবাসা থাকতে পারবে না।

–

Read in Web -

https://jkl-2.herokuapp.com